বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

কৃষ্ণকান্তের উইল

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে]

কৃষ্ণকান্তের উইল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
৬—৩০।৫।১৯৪৪

ভূমিকা

[সম্পাদকীয়]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে কোনও কোনও সমালোচক তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিয়াছেন ; প্রথম স্তরে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' ; তৃতীয় স্তরে, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' ; বাকী সবগুলি গল্প ও উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও শেষ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অবশ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "ক্ষুদ্র কথা" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্ত্তমান রূপ (৪৩৪ পৃষ্ঠা) গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অধুনাপ্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেষোক্ত উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা-হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করিতেন।

রস বিচার আমাদের ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে, আমরা ভূমিকায় পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি মাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পুস্তক পুস্তিকা এবং সাময়িক-পত্রে ইহা লইয়া এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বিরাট একটি গ্রন্থ হইতে পারে। রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বহু বার জবাব-দিহি করিতে হইয়াছে। উত্যক্ত হইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন :—

> …অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"রোহিণীকে মারিলেন কেন ?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট হইয়াছে।" কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।
>
> —'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮৪, পৃ. ৪৬৬।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর (সেপ্টেম্বর ?) মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারাসত হইতে অস্থায়ী ভাবে মালদহে রোড-সেসের কাজে যান। অসুস্থতাবশতঃ সেখান হইতে ছুটি লইয়া (১৮৭৫,২৪ জুন) তিনি কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। এই অবসরকালেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা আরম্ভ হয়। এই সময়েই উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ফাল্গুনে নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া উহা বন্ধ হইয়াছে দেখিতে পাই। চৈত্র মাসে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কোনও পরিচ্ছেদ বাহির হয় নাই এবং চৈত্র মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' "বিদায় গ্রহণ" করিয়াছে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বাহির হয়; 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও দশম পরিচ্ছেদ হইতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে। ঐ বৎসরের মাঘ মাসে ৪৬ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট, মোট ৪৭ পরিচ্ছেদে উপন্যাস সম্পূর্ণ হয়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৫, ভাদ্র) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭০। দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭১) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং চতুর্থ বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে শেষ সংস্করণ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৬) ১৮৯২ সালে বাহির হয়। আমরা আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭২। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কোনও সংস্করণেই কোনও "ভূমিকা" বা "বিজ্ঞাপন" ছিল না।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী ও গোবিন্দলাল-চরিত্র পরবর্ত্তী কালে পুস্তক প্রকাশের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতি আছে। 'বঙ্গ-দর্শনে'র রোহিণী দুশ্চরিত্রা, লোভী। প্রথম সংস্করণের রোহিণী প্রায় তাই, দুশ্চরিত্রতা ও লোভ একটু কম দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে রোহিণী আশ্চর্য্যরকম বদলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রে সংযম ও দৃঢ়তা নাই বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা নয়, লোভী মোটেই নয়। শেষ পর্য্যন্ত রোহিণী তাহাই আছে। গোবিন্দলালের চরিত্র 'বঙ্গদর্শন' এবং প্রথম তিন সংস্করণের পুস্তকে প্রায় অনুরূপই আছে। চতুর্থ সংস্করণে শেষাংশের পরিবর্ত্তনে চরিত্রও পূর্ব্বাপর বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছিল—শেষের গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎ-সাধনা দ্বারা শান্তি লাভ করিয়াছিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই জনের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২০ সালের 'ভারতবর্ষে'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্গদর্শন' ও বর্ত্তমান সংস্করণ পুস্তকের পার্থক্য প্রদর্শন করেন।

১৩৩৬ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্পে' দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয় বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তকের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করেন। আমরা পরিশিষ্টে "পাঠভেদে" প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ দেখাইয়াছি ; ইহা হইতেই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রায় সকল প্রকার পরিবর্ত্তনেরই কিছু আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তাঁহার বর্ণনাবাহুল্যের অভাব এবং আড়ম্বরহীনতা। আয়োজন এবং উপকরণ খুব অল্প, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি ছাড়া গ্রন্থকার বাহিরের কোনও অলঙ্কার অথবা অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। দক্ষ মূর্ত্তিকারের মত যে মাটির তাল লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা সুরু করিয়াছেন, সমাপ্তিশেষে দেখা যাইতেছে, তাহার এক কণিকাও অবশিষ্ট নাই, অথবা একটি কণিকারও অভাব ঘটে নাই। এমন অপরূপ শিল্পচাতুর্য্য, এমন সংযত ভাবপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিন্যাস এবং সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ বাংলা-সাহিত্যের অন্য কোনও উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বঙ্কিম-চন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' চরমে পৌঁছিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অপর লক্ষণীয় বিষয়, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয় পুস্তকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ছড়াইয়া আছে। শুধু জমিদারের কাছারিবাড়ী নয় ; গ্রামের পোস্ট-অফিস, মেয়ে-মজলিস, এমন কি, চাষী ও ভৃত্যদের পরস্পর কথোপকথনের এমন নিখুঁত ছবি তিনি আঁকিয়াছেন যে, মনে হয়, তিনি আজীবন এইগুলির মধ্যেই বাস করিয়াছেন। আদালত এবং সাক্ষীদের জোবানবন্দীর চিত্রাঙ্কনে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাইয়াছেন। মোটের উপর, এমন অল্প পরিসরের মধ্যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাষায় তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে একটি মহাকাব্য রচনা করিয়া-ছেন। এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, শশাঙ্কমোহন সেন ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক লেখকদের লেখায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার ইতিহাস সামান্যই পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'নারায়ণে' 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল-পাড়ায়'-শীর্ষক প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়া বাস ত্যাগের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যাদবচন্দ্রের এই সময়ের কোনও উইলের কথা স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা আরম্ভ করিয়া

থাকিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রকাশেরও উল্লেখ আছে। যথা—

> নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধান একখানি কৃষ্ণকান্তের উইল আমাকে দিলেন, বলিলেন "রেলগাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।···

ঐ সংখ্যার 'নারায়ণে' "অর্জ্জুনা পুষ্করিণী" নামে বঙ্কিমসহোদর পূর্ণচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ আছে, তাহার প্রথম তিন পংক্তি এইরূপ—

> অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। 'বারুণী' পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র।···

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দুইটি ইংরেজী অনুবাদ হয়। সুপ্রসিদ্ধা মিরিয়ম এস. নাইট (Miriam S. Knight)-এর অনুবাদ জে. এফ. ব্লুমহার্ট (J. F. Blumhardt)-কৃত ভূমিকা, গ্লসারি ও টীকা সমেত লণ্ডন হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 'মডার্ন রিভিউ' অফিস হইতে দক্ষিণাচরণ রায়-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র হিন্দী, তেলেগু ও কানাড়ী অনুবাদ যথাক্রমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা হইতে এ. উপাধ্যায়, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মছলিপট্টম হইতে সি. এস. রাও এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে বি. বেঙ্কটাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আইনের ভুল লইয়াও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী ; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্মুখ। বাঙ্গালির উইল প্রায় গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল?" গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা।

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে।" গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই;—

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্তন করিয়া আমাকে ।৹ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে এক জন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ সকল লেখা পড়া তাহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে এক জন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করো্যে তাই বল্‌ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করব ভাই! কর্ত্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই, মার না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করো্যে নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোওয়ালা-কোওয়ালার কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক্ সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাই রে।

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারি কালি কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারি কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারি কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারি নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?"

"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এ ত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্রহ্ম। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখান উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য

ইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া ইবে। এইখানি কর্ত্তাকে দিয়া, কর্ত্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলটা খেলোছ াল।"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু ালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। াট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া লিল, "বলি, ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে াইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, মি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া হাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ তে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ লালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি মায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস াইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে, মি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা, সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁপা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে।"

হর। পার নাই নাকি?

ব্র। ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হ। পার নাই?

ব্র। না ভাই—এই ভাই, তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্ম্মা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।"

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল; পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার জন্য রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল; বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভর্জ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলাল বাবু জুতা সমেত মস্ মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল, ভীত হইয়া, ভর্জ্জিত মৎস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে তৎপর হইল; রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কাকা, কবে এলেন?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল; বলিল, "আজি এখানে খাবেন? সরু চালের ভাত চড়াব কি?"

হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটি পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, "সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে। মনে পড়ে?"

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল দাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা; জনকত বদমাস তোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমায় পাল্কি বেহারা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

হর। দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?"

রোহিণী শিহরিল। বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না!

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণি, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক—বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্বজন সকলেরই তা হলে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণি, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি, কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ—মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ—অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা ছ কড়া ছ ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমস্সুক। তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী? ঠাকুরকে এই বেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালাবাড়ী মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি?

কৃষ্ণ। তাই ত! তবে কি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধর্‌য়ে দিতে পারবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃ। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জন্য!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য, আফিঙ্গ চাই না। কাকা বল্‌লেন যে, যে উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেষ্ট ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চসমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চসমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারি বার আফিঙ্গের ঝিমকিনি আসিল—সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চসমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড় হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন, নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিঙ্গের নেশায় বিভোর; না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্দ্ধনিদ্রিত —কখন অর্দ্ধসচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিবায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা

ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কাণে গেল—এ কি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক এক জন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে। ভাগ্যশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ—হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল—আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল—বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়া ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

রোহি। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রোহি। এখনই যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রোহি। তা যাও।

হর। উইল ?

রো। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি ? উইল আমায় দিবে না ?

রোহি। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন ?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল, বলিল, "তা হবে না—রোহিণি! টাকা যাহা চাও, দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য ?

রোহিণীর মুখ শুখাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল ; বলিল, "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল ? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল ? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল ? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্ব্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে ? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে—উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা কাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্য বাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয়ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু"—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—"কুহু"—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয়ত, তাহাতে অন্যমনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা, কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন; কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ্ বালাই ছিল না, সুতরাং জল আনা, বাসন মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে ; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহঃ কুহঃ কুহঃ! রোহিণী চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে

ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উ।" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে

আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা! রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও

রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাঁহার পার্শ্বে চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?"

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "এক দিন বলিব। আজ নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন বক্—বক্—গল্—গল্—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী, কি মনুষ্যকলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয়

কেন যে এত কালের পর, তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এ দিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে, অর্দ্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধ-বিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসংকল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তির রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ্—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কীদ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন, কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে সুখানুসন্ধানে গমন করিয়াছিল—শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেরাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বলিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,"এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?"

রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল,"তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।"

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

"হাঁ হাঁ, ও কি কাড়? দেখি দেখি" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পোড়াইলি?"

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, "উইল! উইল! আমার উইল কোথায়?"

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত?"

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চস্‌মা বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি?"

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল। জাল উইল কে করিল? তুমি তাহা কোথা পাইলে?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি?

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কি না?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিষে দিব না,

কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন!"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ?"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাঁহার পিতা মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতা-বশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

তোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্ত নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি—চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে—মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পর্দ্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিট্‌কারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী ননদ ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১—আর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ?

নং ২—এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আস্‌বো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌ ঠাকরুণ—বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন করে জান্‌বো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল, "আগে বল না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোন নি! পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২ বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নং ৩—মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বল্‌ব বৌ ঠাকরুণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫—ভিজে বেরালকে চিন্‌তে জোগায় না।—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করিলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা কর্‌বে, দোষ হবে আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক জনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন—কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি। কি হয়েছে?"

তখন আবার চারি দিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বড় কষ্টে, ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্ত্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, "তার পর? কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুণের—আর কার?

নং ২—সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে!

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, বলিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব ?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব ?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় তত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী. আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গেবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?"

ভ্র। কেন ?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল—"কোথা যাও ?"

গো। কোথা যাই বল দেখি ?

ভ্র। এবার বলিব ?

গো। বল দেখি?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্‌নদ করিয়া বসিয়া, সোণার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। এক পাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, খোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয়?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ—তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয়?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কাণে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে। ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া, জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ। ও আর বলিবে কি? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণি?"

রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদজাত নহে। ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি! আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, রোহিণি?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি!"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

কৃ। কি ?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি, তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে ? কেন ছাড়িব ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু করবে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো ! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগদীকে বলিলেন, "ও রে ! একে সঙ্গে করিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্, যেন পালায় না।"

নগদী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা ! দুর্গা ! ছেলেগুলো হলো কি ?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে ?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে একটি রূপকথা বল না।"

এ দিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?" বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্যা। বলিল, "কর্ত্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত।"

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি?

রো। বলিয়া কি হইবে?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন? যাই হৌক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার যোড়া নাই। যাই হউক, এ কাতরা—ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা নহে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি পারি, কর্ত্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন?

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিতে লাগিল, "এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্ত ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণী। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্ত দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্তবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না।' আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া, আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?"

রো। আসল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোহিণি?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণি?

রো। কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন—একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, "রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না?"

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমার আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব?

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার এক জন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য; তোমার জন্য, কর্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি!

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা

নাদস্বরে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ-বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে—এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?" এমত সময় কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া, কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল; এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, কার্ত্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান্ স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না—মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি

করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল, কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারির কথা পাড়িল—জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক্‌ দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায়?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল, "আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে. উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই

হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে। আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?—রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?"

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাব্‌ছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় ভাব্‌ছ না? আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি! আমি অন্য মানুষ ভাব্‌তেছি।

ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ—কাকে ভাব্‌ছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি করবো—বল না।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌বো এখন—বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে?

গো। তা কি জানি?

ভ্র। জান—বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্র। না। যে যাকে ভাল বাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভাল বাসি।

ভ্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভাল বাস—আর কাকেও তোমার ভাল বাস্‌তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ—যা করতে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভাল বাসি।

ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্লনীলোৎপল-দলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর, কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভাল বাসি না। রোহিণী আমায় ভাল বাসে।"

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর?

গো। তর পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটাসোটা গাটা গোটা—মল পায়ে—গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি,—রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পারবি ?"

ক্ষীরি বলিল, "পারব না কেন ? কি বল্‌তে হবে ?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্‌লেন, তুমি মর।"

"এই ? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্‌।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয় যে—বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস্‌ ?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস্‌ ?"

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি। বলিল যে "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা !"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে ?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা

সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,—তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃণ্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভাল বাসিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও কখনও ভ্রমরকে উদ্যানভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত—কখনও কখনও গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখনও কখনও তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান-পরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেক ক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিষেকনিরতা পাষাণ-সুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্ণের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল এক জন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষা জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদ্গীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয়, ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়; তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত দুইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি!"

মুখে ফুঁ! সর্ব্বনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফুঁ—"সেটৈ পারিব না মুনিমা!"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্ব্বন করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কট্‌কি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পস্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অবধড়।"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্ল্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুর্‌পো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীল জলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে—এক দিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এদিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল-হস্ত-প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর এক দিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?"

গো। তুমি মরিবে কেন ?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই ?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড ? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে ? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন ; বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে ?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা,একেবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল,"আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখনও কি থাকি না?

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি। —আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর!

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও—আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ড পড়িল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমীদারীর কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাসখেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সুচ, সুতা, উল, পেটার্ণ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপুর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত—ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহনা করিতে আরম্ভ করিল—"আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।" বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মর্‌তেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্‌ করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচী চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সে দিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে

ঢেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর, ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই করগে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রত্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন, সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া, রঙ্গকরা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর এক জন পাচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর—আর বড়-লোকের কাজ করা হল না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে ?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা—পাড়ার কালা-মুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা আমরা চাকর বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো ? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগান বেড়াইতে কে গেল ?

ক্ষী। আর কে যায় ? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল। রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন ? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা ?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থশরীরে প্রফুল্লহৃদয়ে বারুণীর স্ফাটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেজ বাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাহার অস্তগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি—হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ! তাহা আমি

অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি না?" ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সত্য ঠাকুরঝি?" ঠাকুরঝি তখন ফুলধনুর মত দুইখানি ভ্রূ একটু জড় সড় করিয়া, অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া, বলিল, "বলি, রোহিণীর কথাটা?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া, কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে?"

ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি?"

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "পোড়া কপাল। এত লোক শুনিয়াছে—কেবল তুই শুনিস্ নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে, একটা পুত্তলের মুণ্ড মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।"

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দিনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরাকে বলিল, "আশ্চর্য্য কি? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—

কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।"—কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন! তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী শাড়ী ও এক শুট গিল্‌টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে, সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায়

তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী শাড়ী ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর নাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্‌বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভাল বাসিত, সেই জন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভাল বাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা "স"র মত হইল—"স"গুলা "ম"র মত হইল—"ধ"গুলা "ক"র মত, "ক"গুলা "থ"র মত, "থ"গুলা "খ"র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের লোপ,—ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছে—

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) "দাস্যা" (আগে দাশ্বা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো—দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামাঃ" ("প্র" লিখিতে প্রথমে "প্র", তার পর "শ্র", শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিশেস" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)।

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জ্ঞান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও

বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।—যাহা হৌক,—তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন।—ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না।—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্ণমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল

জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভাল আছ ত?" হয়ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া, গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পাল্কী লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ও দিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাঁহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উঁকি ঝুঁকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট

বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে—কখনও মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, এক জন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদগ্রস্ত হয়, ভাবিয়া, গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কুক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণি?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজ তিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল —কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল —এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তি-গণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া

নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন, বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদায় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখনই নাএব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত এক জন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর দিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অৰ্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অৰ্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ!" সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর," "ভোমরা", "ভোমর", "ভোম", "ভুমরি", "ভুমি" "ভুম", "ভোঁ ভোঁ"—সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে

প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি," নয় "কে ডাকিতেছে," বলিয়া এক জন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোণায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্নরবিকরপ্রফুল্ল হৃদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী,—ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকারে, আলো করিবার জন্য ভাবিত—যম! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদ্‌ভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২॥।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকী নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকী রাখিয়া নামাবলী

কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার, না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর!

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে?"

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।"

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই কি তার এত দোষ?"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার! যে চুরি করে তার কিছু নয়!

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝকড়ায় আমি পারব না। দেখ্ না, ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আস্‌ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল?

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?

সুমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। আরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহ-জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এত দিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ্ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, "ভয় কি? বিষ খাইব।"

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বেগ, গাঁটরি বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া, দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এ দিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?"

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, "দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না।

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, আপনার সমুদায় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—

ইহার নকল আছে।”

গো। থাকে থাক্। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।”

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?—"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে ঊর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমায় স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?"

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাই হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—"ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি," তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা

করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া—বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,—গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সঙ্গে, নির্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ--চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য

সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন—সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিতগঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্ম্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে [illegible] হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "যে আমার কন্যার উপর [illegible] উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ [illegible] কাতর-

তার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,"যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এমনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন,"মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন ; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয় ; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে ?

মা। সারিবে মা—কি হইয়াছে ? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব—তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে ?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন ?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব ?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দিশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট আপিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে, আমি একটা ডিপুটি—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ—উহাতে আমাতে জমীন আশমান ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরিবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন—সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আশী আনার ওজনে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া, চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয়, এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল—কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে—সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ?"

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, "হাঁ—তু—তুমি—আপনি?"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম!"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, "বসুন!"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন ;—পোষ্ট বাবু ত বলিলেন "বসুন," কিন্তু তিনি বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা—একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামুক সাজ দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বকশিষ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকার তল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোষ্ট। চিনি না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন ; প্রকাশ্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, *তুমি অমনি* কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব—এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোষ্ট বাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন ?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পো। আসে।

মা। কত দিন অন্তর ?

পোষ্ট। যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন ; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখ্‌ছি—আমায় চেন কি ?"

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোষ্ট আপিসের খবর যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?"

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ?

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব ; আদালতে প্রমাণ করাইব যে তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে ?"

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন—বলিলেন, "আপনি রাগ করেন কেন ? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।"

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে ?

পোষ্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিষ্টরি করা

মা। কোন্ আপিস হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে ?

পোষ্ট। মনে নাই।

মাধবী। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না ?

পোষ্ট মাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, "প্রসাদপুর।"

"প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিষ্টি দেখ।"

পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, "যশোর।"

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সব্ ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কন্‌ষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সব ইন্‌স্পেক্টর, মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন—পত্রপ্রাপ্তি মাত্র নিত্রাসিংহ কন্‌ষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিত্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দি মিন্দি কইও না—যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিত্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, "বিপদ্ কি মহাশয়?" মাধবীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদ্গ্রস্ত বটে।"

ব্র। কি বিপদ্ মহাশয়?

মা। বিপদ্ সমূহ। পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি! আমার কাছে চোরা নোট!"

মাধবী। তোমার জানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিসেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিসের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ এক জন পুলিসের কন্‌ষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত জলধরসন্নিভ কন্‌ষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনি রক্ষা করুন।"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি ? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে ? ভয় করে—কনষ্টেবল যে গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত এক জন দ্বারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কনষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল—মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের এক জন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে ?"

নিশা। কোথায় ?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন ?

মা। নীলকুঠি কিনব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই ; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া, পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছেন। এক জন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া এক জন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার থ্যান্ থ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল ; এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সোনালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত

রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধস্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তব্‌লা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে এক জন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতল অট্টালিকার উপর তলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ পরদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখনও গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—সুতরাং সেখানে বহির্ব্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সংবাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওই করিতে লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব ?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি ? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনা সংবাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরী যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি করিও না—যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে ? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে ? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি ! কি চোখ ! এ কোথা থেকে এলো ? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না ? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে উর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না—

জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্ত্তা হই থাকে।

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি ভদ্রলো সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা করে খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।"

বাবু বলিলেন, "তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তুকুতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি কে আপনিই উপরে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ্ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনী বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়্‌কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুয়ার শুণচো না কি?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল!

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু

গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমিও কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাইব?"

"যা খুসি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল, সোণাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোক তাঁকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইশারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, "যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিশ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ ত দেখ্‌চি টাকা রোজকারের দিন। গরিব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না—তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস্।

রূপো বখ্‌শিশের গন্ধ পাইয়াছে—যে আজ্ঞা বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি?"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন।

রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মুনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়াছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে।—অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে

আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুক্কুর-মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর, রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষে নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে রোহিণীর মনের ভাব এই? রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান্—পটলচেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর এক জন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা – আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাবুর কাছে কত দিন আছ ?"

সোণা। এই—যত দিন এখানে এসেছেন তত দিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই ? পাও কি ?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি ?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে ?"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি ? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়্‌বে ?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাক্‌রুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত ?

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পার্‌বে কি ?

সোণা। ভাল কাজ হয় ত পার্‌ব না কেন ?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাক্‌রুণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। বুঝেছ ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার ?

সোণা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখ্‌বে, ঠাকুরুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তার পর আমার সঙ্গে যুটো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারি দিকে শৃগালকুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তর মধ্যে কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! এক জন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কে?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশা। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্‌তে পারি নে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?"

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ্ বুঝিয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিকম্পিতস্বরে বলিল, "ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!"

গোবিন্দলাল বলিল, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।"

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, "রোহিণী!"

রোহিণী বলিল, "কেন!"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি ?

গো। তুমি আমার কে ?

রো। কেহ নহি, যত দিন পায়ে রাখেন তত দিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সর্ব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম ? তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম ?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণী, দাঁড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাহিব কেন ? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে ?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন ? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন ? ইহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন ?"

রোহিণী বলিল, "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।"

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালকনখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্রি এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন, তাহা ভৃত্যেরা পর্য্যন্তও জানিত না। দারগা কিছু দিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন

অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে এক জন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিব্ ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসীতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, তথাচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার

জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তা হলে বোধ হয় কোন আপদ্ থাকিবে না।"

ভ্র। আপদ্ থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু, তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিসের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জানে না কি প্রকারে?

যামিনী। তা না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি?"

যামিনী। পুলিসের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন? কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্য বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন।

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ্ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ্ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে—আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানস চক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না। কোন সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি কাশি রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ

আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইনস্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপা কোন্ দেশে গিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন—আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—সুশাসন জন্য সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন—তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌঁছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌঁছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে

বলিলেন, "বাপু! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দ্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই—না—মনে ত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, সাক্ষী, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ করিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ সপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার যে সকল

দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচ জনে লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট চৌকাট পর্য্যন্ত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব--গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে? তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্রমর!

ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রি অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

'আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব। পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আমার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যত দিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, তত দিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল—কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন—বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিষ্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরূপে গেল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধসেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি—সম্মুখে ফাল্গুন মাস—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অঙ্গুরটিপনি দিতে ভুলিস্ না। রোগে হউক্, অঙ্গুরটিপনিতে হউক্—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা; আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল, "আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না?"

যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজি সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই, এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই-একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজি আবার আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল, "কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুজনেই কাঁদিতেছিল। এক জনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল।—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল।—সরোবরে কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ

নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদগীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী ;—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক ; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত ?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল ? কে এমন হারাইয়াছে ? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।—ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি না যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনাবাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পূরিয়া গিয়াছে—দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী-পুষ্করিণী-তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে স্ফাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন—ভ্রমর বলিয়াছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া

গাছে বাগান পরিপূর্ণ ; লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রস্তরমূর্ত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; ঝিলমিল শার্সি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে—মর্ম্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সে বাগানে আর ফুল ফুটে না—ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল - প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল ? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল তাহারা দুই জনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্ক পত্র নড়িতেছে—বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বনমধ্যে বন্য কীটপতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্নপুত্তল-পদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর-রোহিণীময় অনল-কুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

"এইখানে !"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে—কি ?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে—

"এমনি সময়ে !"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণি ?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,

"আমি ডুবিয়াছিলাম !"

গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব ?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে ; প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন ? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে ? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে—যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল—এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। প্রত্যহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিল ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস্ ও উইলো।—প্রমোদভবনের পরিবর্ত্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন করিল না। বহুল অর্থ-ব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান
হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

সমাপ্ত

পাঠভেদ

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' আরম্ভ হয়। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনে নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। চৈত্র-সংখ্যা বাহির করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বসম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। অসম্পূর্ণ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় বাহির হইতে থাকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বৈশাখ হইতে আবার আরম্ভ হইয়া (দশম পরিচ্ছেদ হইতে) মাঘ-সংখ্যায় শেষ হয়। মোট ৪৬ ও পরিশিষ্ট—এই ৪৭ পরিচ্ছেদে উপন্যাস সমাপ্ত হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭০। পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রথম খণ্ডে ৩১ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫ ও পরিশিষ্ট, মোট ৪৭ পরিচ্ছেদই থাকে। দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭১। চতুর্থ সংস্করণই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ, ইহা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৬। বর্ত্তমান সংস্করণ এই চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণের একখানি আখ্যাপত্রহীন বই দেখিয়াছি, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭২। 'বঙ্গদর্শন' হইতে প্রথম সংস্করণ পুস্তকে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত বেশী, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পার্থক্যও কম নয়।* ঐ দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণেরও কিছু তফাৎ ঘটিয়াছে। আমরা প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ দিলাম।

পৃ. ৩, পংক্তি ৭, "কৃষ্ণকান্তকে জেঠা মহাশয় বলিতেন।" কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর সম্বন্ধ ছিল, এ জন্য ব্রহ্মানন্দ

পৃ. ৮, পংক্তি ৬ হইতে পৃষ্ঠা ১০, তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ছিল—

---

* "...কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেকমাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।...১১ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৩] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ"—'বঙ্কিমচন্দ্র'-লেখক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র।

এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

স্ত্রীলোকটি দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "আমি রোহিণী।"

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছে—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিষ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য; রোহিণী তাঁহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম?"

রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব শুনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

হরলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি রোহিণি?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ? তবে কি টাকা আগামী দিতে হবে নাকি?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন?

হর। কবে এটা পারবে?

রো। আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, "ভাল," এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

পৃ. ১২, পংক্তি ১৩-১৪, "আমি কি বুড় হইয়া বিহ্বল হইয়াছি ?" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল, "আমি কি এতই বুড় হইয়াছি ?"

পৃ. ১২, পংক্তি ১৭, "রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের" কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

রোহিণীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, তাহা জানিয়া গেল।

পৃ. ১৩, ৮ম পংক্তির পূর্ব্বে ছিল—

হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরিমাত্রপরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেও রোহিণীর কৌশল। নহিলে দ্বার খোলা থাকে না। এদিকে

পৃ. ১৩ হইতে পৃ. ১৪ পঞ্চম পরিচ্ছেদটি নিম্নলিখিত মত ছিল—

মুগ্ধা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল—যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্প দম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল, "তার পর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি, উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল, কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন ? ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে, তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন! আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে, রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইলখানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে, আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্য ভাগ; আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রোহিণীর হস্ত ধারণ করিলেন। এবং বলে উইলখানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সম্বাদ দিই যে, তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে—তিনি নূতন উইল করুন।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তবে অধঃপাতে যাও।" এই বলিয়া হরলাল সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।

পৃ. ১৬, পংক্তি ১৬, "বকুলের" স্থলে "নিম্বের" ছিল।

পৃ. ১৮, পংক্তি ২১, "রোহিণীর অনেক দোষ" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল।

পৃ. ১৯, পংক্তি ৪, "এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে" এই অংশের পূর্ব্বে ছিল—

এখন, রোহিণী বড় মুখরা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটি অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু

পৃ. ১৯, পংক্তি ১৫, "মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

অতি ঘৃণাযোগ্য মুখরার ন্যায় অনর্গল কথোপকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত অর্থপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছিল

পৃ. ১৯, পংক্তি ২৫, এই পংক্তির পূর্ব্বে ছিল—

কি কথা রোহিণি? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?

পৃ. ২০, পংক্তি ২২-২৩, এই দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নাংশ ছিল—

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার!

সু। তা, গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না?

(N. B.—এই কথাটা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

সু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে, টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরম পদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এত দিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল। হাজার টাকা কতদিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

পৃ. ২৩, পংক্তি ১, "জাল উইল চালান হইবে না।" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

হরলালের বশীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে পারে না—

পৃ. ২৩, পংক্তি ১১, "হরলালের লোভে" স্থলে "অর্থলোভে" ছিল।

পৃ. ২৩, পংক্তি ১৫, এই পংক্তির শেষে ছিল—

এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল।

হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুধানুসন্ধানে গমন করিল।

পৃ. ২৩, পংক্তি ২২-২৩, "পুরী সুরক্ষিত ··রুদ্ধ হইত না" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

হরির কৃপায় পথ সর্ব্বত্র মুক্ত।

পৃ. ২৪, পংক্তি ১২-১৩, "পাইলেন না।···তখন কৃষ্ণকান্ত" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "না পাইয়া" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ২৫, পংক্তি ২৭, "মন্দ কর্ম্ম করিতে" স্থলে "মন্দ অভিপ্রায়ে" ছিল।

পৃ. ৩৩, পংক্তি ৫, "বিশেষ" স্থলে "বিশ্বাস" ছিল।

পৃ. ৩৩, পংক্তি ১৯, "নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন?" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

বুঝি বিধাতা তোমাকে এত গুণেই গুণবান্ করিয়াছেন।

পৃ. ৩২, পংক্তি ২৭, এই পংক্তির পর নিম্নাংশ ছিল—

গোবিন্দলাল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটি করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী বলিল, "তাহা নহে। এ কার্য্যের জন্ত তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আনিয়া দেখাইতেছি।"

পৃ. ৩৫, পংক্তি ৪, "কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে ?" এই অংশের পূর্ব্বে ছিল—

আমি ত তোমায় কোন টাকা দিই নাই—তবে

পৃ. ৩৫, পংক্তি ৪-৫, "আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ ৩৫, পংক্তি ৬-৭, "অনুরোধ করেন নাই" স্থলে "টাকা দেন নাই" ছিল।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ১২, "আর কিছু বলিবেন না।" কথাগুলির পূর্ব্বে "মেজ বাবু"—" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ১৫, "একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি।" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

আমায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২০, "সমুদ্রবৎ সে হৃদয়" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

তাঁহার হৃদয় সমুদ্র—

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২২, "আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন ?" এই কথা-গুলির পরে ছিল—

আমার কথা শুন—আগে বড়বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও—সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিব। তার পর—

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২৪, "তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।" এই অংশের পূর্ব্বে "তার পর," কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ১৫, "ছাড়িবেন কেন ?" কথা দুইটির পূর্ব্বে "সহজে" কথাটি ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৩-২৪, "খুড়ার সঙ্গে…বলিয়া, ঘরের" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

হরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল—কিন্তু গেল না।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৪, "মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া," এই কথা কয়টির পরে ছিল—

নোটগুলির উপর পা রাখিয়া,

পৃ. ৩৯, পংক্তি ৮, "কালামুখী রোহিণী উঠিয়া" কথাগুলির পরে ছিল—

নোট গুটাইয়া লইয়া,

পৃ. ৩৯, পংক্তি ২১, "পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

নোট ফিরাইয়া দিল।

পৃ. ৪১, পংক্তি ২০, "কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—" এই কথাগুলির পরে ছিল—

আমাকে আর দেখিতে না পায়।

পৃ. ৪২, পংক্তি ২৪, এই পংক্তির পূর্ব্বে ছিল—

গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যে জন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।

পৃ. ৪৩, পংক্তি ৭, "পাতার গাছের শ্রেণী" স্থলে "পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী" ছিল।

পৃ. ৪৪, পংক্তি ২১, এই পংক্তির পরে ছিল—

আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা বুঝা যাইবে।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১, "গোবিন্দলাল জানিতেন," কথা দুইটির পরে ছিল—

যাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহির করান যাইতে পারে।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১৩-১৪, "সেইহি পারিব না মুনিমা!" ইহার স্থলে ছিল—

তা হেবে না অবধড়!

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১৫-১৬, "শালগ্রামশিলা···করিতে পারিত" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

শালগ্রামের উপর পা দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে দিলে দিতে পারিত

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১৬, "কটুকি" স্থলে "জগন্নেথে" ছিল।

পংক্তি ২১, "ভদরক" কথাটি "ভদরক-অ" এইরূপ ছিল।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ১২, "তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!" এই কথা কয়টির পরে ছিল—

আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে—আমার প্রাণ গেল! রোহিণীর পাপরূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে

পৃ. ৫২, পংক্তি ২৮, "রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা" কথা দুইটির স্থলে "রটনা-কৌশলপরকলঙ্ককলিতকণ্ঠ" ছিল।

পৃ. ৫৫, পংক্তি ১৮, "আমাদের পাঠিকারা" কথা দুইটির স্থলে "আমরা" এবং ১৯ পংক্তিতে "করিতেন" স্থলে "করিতাম" ছিল।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ১৪, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে।" এই কথা কয়টির পরে ছিল—

শ্বশুর শাশুড়ী আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না। কোন চিকিৎসা পত্র করেন না—পীড়ার কথা স্বীকারই করেন না।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ১৬, "পীড়ার কথা বলিও না" এই কথাগুলির পরে ছিল—

তাহা হইলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে

পৃ. ৫৯, পংক্তি ৩, "এত অবিশ্বাস!" কথা দুইটির স্থলে ছিল—

আমি কেবল ভ্রমরের জন্য এ তৃষায় দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু ভ্রমরের এই ব্যবহার?—এই অবিশ্বাস!

পৃ. ৫৯, পংক্তি ৮, এই পংক্তির পরে ছিল—

গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে; ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।

পৃ. ৬১, পংক্তি ৪, "বুঝিয়া" কথাটির পরিবর্ত্তে "গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া" ছিল;
পংক্তি ১০, "পুণ্যাত্মাও" স্থলে "পাপিষ্ঠ" ছিল।

পৃ. ৬২, পংক্তি ৬, "তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—" কথা কয়টির পরে ছিল—

মনে মনে স্থির সংকল্প অন্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।

পৃ. ৬৪, পংক্তি ২৬, "ভোঁ ভোঁ," কথা দুইটি ছিল না।

পৃ. ৬৫, পংক্তি ৪, "সে কথা বলিবার" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

যে কথা অর্দ্ধেক মাত্র বলিতে হইত, আর অর্দ্ধেক না বলিতেই বুঝা যাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা বলিবার

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৪, "ইচ্ছামত" স্থলে "যথেচ্ছা" ছিল।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৬, "ক্ষমা কর !" কথা দুইটির পর পুনরায় "ক্ষমা কর !" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২৩-২৪, "চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

দ্বারদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

পৃ. ৭৩, পংক্তি ১৭, "দেবতা সাক্ষী" কথা দুইটির পূর্ব্বে ছিল—

একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব, ভ্রমর কোথায় ?

পৃ. ৮০, পংক্তি ১৮, "নির্ব্বোধ" স্থলে "হনুমান" এবং পংক্তি ২২, "অবতার" স্থলে "বাঙ্গাল" ছিল।

পৃ. ৮৪, পংক্তি ২১-২২, এই পংক্তি দুইটির স্থলে ছিল—

মা। জ্বিলা—জশ—শ—শর—

নি। জশ্—শরে কেন ?

পৃ. ৮৬, পংক্তি ৪, "গায়কের" স্থলে "বৃদ্ধের" ছিল।

পৃ. ৯৯, পংক্তি ২৫-২৬, "তাঁহার পত্নী অতি" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

তিনি তাহা আপন পত্নীর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন।

পৃ. ১১০, পংক্তি ২০, "কালো মেঘ শাদা হইল—" কথাগুলির পরে ছিল—

পৃথিবী আলোকের হর্ষে হাসিয়া উঠিল—যেন কিছুই হয় নাই

পৃ. ১১৪, পংক্তি ১৬-২৮, এই পংক্তি কয়টির স্থলে ছিল—

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ২, "ভাগিনেয় শচীকান্ত" কথা দুইটির পূর্ব্বে "অপ্রাপ্তবয়ঃ" কথাটি ছিল।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ২-৩, "শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—

কয়েক বৎসর পরে শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ৪, "প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

যখন মানুষ হইল, তখন সে

পৃ. ১১৫, পংক্তি ১৮ হইতে পৃ. ১১৬, শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত ছিল না।